# আমার গুরুজি রবিশঙ্কর— যেমন দেখেছি আমি

## পার্থসারথি

*ভারতীয় ধ্রুপদি সঙ্গীতে তরুণ প্রজন্মের শিল্পীদের মধ্যে অন্যতম সঙ্গীত ব্যক্তিত্ব শ্রী পার্থসারথি। সরোদে তাঁর অনন্য প্রতিভা গুণীদের দ্বারা সর্বত্র আদৃত হয়েছে। দেশে ও প্রবাসে অনেক অনুষ্ঠানে তাঁর বাদনশৈলীর প্রখরতা শ্রোতাদের দ্বারা অভিনন্দিত হয়েছে। আমরা এই শিল্পীকে খুঁজতে খুঁজতে পৌঁছে গেলাম নির্দিষ্ট ঠিকানার। তখন সকালের রোদ কোলাহল নন্দিত শহরে লুটিয়ে পড়েছে পিচের রাস্তায়। আলাপ দীর্ঘস্থায়ী না হলেও সংক্ষিপ্ত পরিসরে, আড্ডার মেজাজে শিল্পী শোনালেন তাঁর সফল সাংস্কৃতিক জীবনের কিছু স্মৃতি, মহান শিল্পীদের কথা, যাঁদের সাহচর্যের প্রেরণায় হেঁটে এলেন এতটা পথ। আমরাও পার্থসারথির সঙ্গে স্মৃতির অলিন্দে হাঁটতে হাঁটতে সেইসব মহান কলকারদের সান্নিধ্যের উত্তাপ পেলাম। পাঠকের সামনে সেইসব স্মৃতিমেদুর উচ্চারণগুলি, আড্ডার অনিয়মিত বাক্যালাপ রাখা হল।*

---

আমার সঙ্গীত শিক্ষার শুরু যখন আমার বয়স আটবছর। শেখার শুরুটাও বেশ মজার। আমি নিজেও জানতাম না যে আমি ক্লাসিক্যাল মিউজিক শিখতে যাচ্ছি। সেটা কেমন করে সম্ভব হল সেটা বলছি। আমি ছোটোবেলা থেকেই, প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানতই দেখতাম যে আমাদের বাড়িতে সেগুন কাঠের একটা বড়ো আলমারি আছে, আলমারিটা বেশ চকচকে এবং তার মাথার ওপর একটা বড়ো জিনিস কাপড়ের ঢাকা দিয়ে পড়ে আছে। আমার যখন বয়স আট তখন একদিন কৌতূহলবশত বাবাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'বাবা ওটা কী?' বাবা বললেন যে ওটা একটা মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট এবং নামিয়ে দেখালেন। বাবা জিজ্ঞাসা করলেন যে 'শিখবি নাকি?' আমি তখন কিছু না বুঝেই কৌতূহলে বললাম, 'হ্যাঁ শিখব।' আমার বাবা ছিলেন সুধাময় চৌধুরী। উনি ফুটবল খেলতে ভালোবাসতেন। ফার্স্ট ডিভিশানের খেলোয়াড় ছিলেন ও সঙ্গীতাচার্য্য রাধিকামোহন মৈত্রের কাছে কিছুদিন শিখেছিলেন। সেই থেকে বাবার কাছে আমার সঙ্গীতশিক্ষা শুরু। প্রায় টানা দেড় বছর শিখেছিলাম বাবার কাছে। তারপর ১৯৬৯ নাগাদ বাবা ওস্তাদ ধ্যানেশ খাঁর কাছে নিয়ে যান। ওস্তাদ ধ্যানেশ খাঁ ছিলেন সঙ্গীত লিজেন্ড ওস্তাদ আলি আকবর খাঁর পুত্র। ওস্তাদ ধ্যানেশজি ছিলেন একাধারে সঙ্গীত শিক্ষক ও অধ্যাপক। তাঁর মতন সঙ্গীতশিক্ষক আমি কমই দেখেছি। আমি প্রায় ১০ বছর ওঁর কাছে শিখেছি। পরের দিকে উনি ২/৩ ঘণ্টা টানা শেখাতেন। জানি না কেন উনি আমাকে বেশি ভালোবাসতেন ও বেশি করে সময় দিতেন। সেইসময় আর একজন সহশিক্ষার্থী ছিলেন মানস চক্রবর্তী। উনি এখন আমেরিকায় আছেন তবে প্রফেশন বদল করেছেন। ১০ বছর পর থেকে আমি মিউজিকে উচ্চস্তরীয় শিক্ষার কথা চিন্তা করতে লাগলাম, যদিও গুরুর অনুমতি নিয়ে, আমরা তখন থাকতাম সেলিমপুরে, যোধপুর পার্কের পাশেই। তখন থেকেই মনে একটা স্বপ্ন ছিল যে পণ্ডিত রবিশঙ্করজি বা ওস্তাদ আলি আকবর খাঁ, বা পণ্ডিত নিখিল ব্যানার্জী বা ওস্তাদ বিলায়েৎ খাঁর কাছে যদি পৌঁছতে পারি।

সেই সময়ে ১৯৭৭ সালে আমার একটা বাজনা ছিল অল ইন্ডিয়া রেডিয়োতে ৪৫ মিনিটের, প্রথম ৩০ মিনিট একটা পুরো রাগ ও পরে ১৫ মিনিট আর একটি রাগ বাজিয়েছিলাম। জানি না কেমন হয়েছিল। কিন্তু সেই বাজনা পণ্ডিত নিখিল ব্যানার্জী শুনেছিলেন। উনি সময় পেলেই রেডিয়োতে নতুন শিল্পীদের বাজনা শুনতেন। শুনে উনি একজনের মাধ্যমে ডেকে পাঠালেন। আমি তো শুনে স্বপ্নে ভাসছি।

ঠিক দিনে ওনার কাছে পৌঁছে গেলাম। আমি তখন রোগা-পাতলাই ছিলাম। আমাকে দেখেই বললেন, 'এই তো এইরকম টাইগার-এর মতন বাজাতে হবে।' এইটে ছিল যেন আমার স্বপ্নের আদেশ। উনি আমার চেহারা দেখে বললেন, 'আরো বেশি করে মাংস-ভাত খাও— চেহারা বাঘের মতন করো ও বাঘের মতন বাজাও। তুমি এমন বাজাবে যে লোকে তোমার কাছে দৌড়ে আসবে। তুমি লোকের পেছনে দৌড়বে না।' ওঁনার এই আদেশ আমি চিরকাল মনে রেখেছি। তাই কারো কাছে বাজনার জন্যে দরবার করতে পারি না। তখন ভাবলাম যে যদি উনি আমার উচ্চাশায় সাহায্য করেন। তার আগে ওস্তাদ আলি আকবর খাঁর কথাও ভেবেছি। কিন্তু তিনি বেশির ভাগ সময় বিদেশে থাকতেন আর আমার এতটা আর্থিক সংগতি ছিল না যে বিদেশে গিয়ে ওনার কাছে থেকে শিখব। আমি ছোটোবেলা থেকেই লাজুক ও ইন্ট্রোভার্ট ছিলাম। তবু সাহস করে নিখিল কাকাকে একদিন বলে ফেললাম আমার স্বপ্নের কথা। শুনে উনি স্বস্নেহে বললেন, "আমি তোমাকে নিশ্চয়ই শেখাব। কিন্তু আমার পারফরমেন্স-এর রিটায়ারমেন্ট এর পর। আমি বাজানো ও

শেখানো— দুটো কাজ একসঙ্গে করতে পারি না।" কিন্তু এই কথাগুলি এত স্নেহের সুরে বললেন যে আমি আর কিছু বলতে পারলাম না। বাবার সঙ্গে বাড়ি ফিরে এলাম।

তারপর ভাবলাম পণ্ডিত রবিশঙ্কর সম্পর্কে। কিন্তু তিনি তো দেশে ছ-মাস ও বিদেশে ছ-মাস থাকেন। তা একদিন মনের জোর করে পণ্ডিতজির সঙ্গে দেখা করতে গেলাম এলগিন রোডে কল্পনা সেনের বাড়িতে— বাড়িটা নেতাজি সুভাষ বোসের পাশের বাড়ি। আমি ও বাবা দুজনে মিলে গিয়েছি— কিন্তু সে বাড়িতে এত লোকের আনাগোনা যে প্রায় ৪ ঘণ্টা বসেও দেখা করার ডাক পেলাম না, ইতিমধ্যে ওপর থেকে শ্রী পি সি দাস যিনি ডোভার লেনে মিউজিক ফেস্টিভালের উদ্যোক্তা ছিলেন, যার বাড়িতে ওস্তাদ আল্লারাখা, ওস্তাদ জাকির হোসেন থাকতেন। তিনি আমাকে দেখতে পান। তিনি বোধহয় আমার বাজনা ইতিমধ্যে শুনেছিলেন বা আমাকে চিনতেন। তা তিনি দয়াপরবশত হয়ে পণ্ডিতজিকে গিয়ে বললেন আমার ইচ্ছার কথা। তবে কিছুক্ষণ পরে পণ্ডিতজি আমাকে ডাকলেন ও জিজ্ঞেস করলেন, 'কী বাজাও?' আমি মিনমিন ক'রে বললাম, 'সরোদ বাজাই।' তা উনি বোধহয় শুনতে পাননি। বললেন, 'হাত বাড়াও', বলেই নিজে হাত টেনে নিলেন। উনি ভেবেছিলেন যে আমি সেতার বাজাই— মেজরাবের কড়া আঙুল খুঁজতে লাগলেন কিন্তু আমি তো সরোদ বাজাই— তাই কিছু খুঁজে না পেয়ে হতাশ হলেন ও বললেন, 'খোকা তুমি কিন্তু রেওয়াজ করো না।' তখন আমি সাহস করে বললাম যে আমি সরোদ বাজাই এবং বাঁ-হাতটা দেখালাম। তখন দেখে উনি হেসে বললেন 'আচ্ছা আচ্ছা।' এরপর আমি সাহস করে বললাম, 'গুরুজি আমি আপনার কাছে শিখতে চাই।' শুনে বললেন যে আগে তোমার বাজনা শুনি, তারপর বলব যে তোমাকে শেখাব কি শেখাব না। তুমি বরঞ্চ শ্যামা দাসের (ওঁর ছাত্র) সঙ্গে যোগাযোগ রেখো। ও জানে কখন আমি কোথায় থাকি। তা তারপরও এক থেকে দেড় বছর কেটে গেল আমি আর ওনাকে আমার বাজনা শোনাতে পারছি না। মন খুবই খারাপ, এইরকম একদিন কলকাতায় এসেছেন গুরুসদয় দত্ত রোডে লালা শ্রীধরের বাড়িতে। বাড়িতে ভীষণ ভিড়, তার মধ্যে ঘণ্টা তিনেক কেটে গেছে, উনি উঠতে যাবেন, তখনই শেষ সুযোগ বুঝে বললাম, 'গুরুজি যদি আমার বাজনাটা শোনেন।' কী মনে হল উনি বললেন, "ঠিক আছে বিকেলে চলে আয়— আমার একটা মিটিং আছে তার আগে ২মিনিট শুনলেই বুঝতে পারব যে তুই কীরকম বাজাস, তখন ঠিক করব তোকে ছাত্র হিসেবে নেবো না নেবো না।"

সেই শুনে বিকেলে পড়িমড়ি করে সরোদ নিয়ে ছুটলাম, সঙ্গে তবলাবাদক সত্যব্রত চ্যাটার্জী (পণ্ডিত অনিন্দ্য চ্যাটার্জীর ছাত্র)। ওর সঙ্গে বাড়িতে রেওয়াজ করতাম। ভাবলাম যদি তবলার সঙ্গে বাজাই,

পণ্ডিতজি হয়তো ইমপ্রেসড হবেন।

কথা ছিল দু-মিনিট শোনানোর কিন্তু আমার মতন করে আলাপ, জোড়, তবলার সঙ্গে বন্দিশ প্রায় ১ ঘণ্টা বাজালাম। উনি সামনে কার্পেটের ওপর বসে, চোখ বুজে খালি ঘাড় নাড়ছেন। প্রায় ১ ঘণ্টা বাজাবার পর আমি গিয়ে ওনার আশীর্বাদ পাবার জন্যে প্রণাম করতে গেলাম। কিন্তু উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন ও বললেন, 'হ্যাঁ, এইরকমই বাজাতে হবে, আর আজ থেকেই তোমাকে ছাত্র হিসেবে নিলাম।' আমি বহুবছর গুরুজির কাছে গিয়েছি, থেকেছি, একসঙ্গে কর্নসার্টে বাজিয়েছি। কিন্তু আমি কোনোদিন গুরুজিকে আলিঙ্গন করতে দেখিনি। সেদিন কেন এমন করলেন— সেটা বোধহয় আমার চরম সৌভাগ্যের দিন।

সকলেই জানেন যে গুরুজি খালি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতশিল্পী ছিলেন না, ছিলেন সারা পৃথিবীর সঙ্গীতশিল্পী। ফিল্ম মিউজিক ডিরেক্টর, মিউজিক অ্যাম্বাসাডর, দশ/বারোটা ভাষা জানতেন, মিউজিক কম্পোজার, ভালো শিক্ষক, গ্রেট ডিপ্লোম্যাট। এরকম গ্রেট কোয়ালিটির এর কম্বিনেশন আমি আর কারো ভিতর দেখিনি। যেমনি দেখতে তার তেমনি গুণ, তারপর বললেন আমাকে বেনারসে চলে আসতে বললেন ও শীতকালে গাণ্ডা বাঁধা হল।

তারপর আমরা দিল্লীতে এলাম ও রেগুলার ওঁর কাছে শিখতে লাগলাম। গাণ্ডা বাঁধার দিন উনি সকলের সামনে বললেন, 'আজ থেকে তুই আমাকে দেখবি ও আমি তোকে দেখব।' সেইসব দিনগুলো আমার জীবনের সোনালি দিন। আমাকে দিল্লীতে বললেন 'তুই কি বাইরে বাজাচ্ছিস।' আমি বললাম, না না, আমি খালি শিখতেই চাই, এখন বাজাতে চাই না।' উনি খুব খুশি হলেন। যদিও ইতিমধ্যে নিখিলকাকার রেকোমেন্ডেশনে আমি আমেদাবাদ, ভোপালে ও বিভিন্ন জায়গায় বাজিয়েছি ও রেডিয়ো প্রোগ্রামের মধ্যে দিয়ে অনেকের কাছে পরিচিতি পেয়েছি।

শেষে ১৯৭৯ এ একদিন বললেন, 'তুই আমার সঙ্গে বাজাবি।' আমি তো তক্ষুনিই গুরুর আশীর্বাদ মনে করে রাজি হয়ে গেলাম। ১৯৭৯ এ ইন্ডিয়া কনসার্ট এর ফেস্টিভাল হয়েছিল মস্কোতে। রাশিয়া গেলাম গুরুজির সঙ্গে তাতে ছিলেন শ্রদ্ধেয় বিশ্বমোহন ভাট, দয়াশঙ্কর, কুমার বোস, রুনু মজুমদার, রমেশ মিশ্র প্রমুখ ফিরে এসে বললেন, 'চ বোম্বেতে সম্মুখানন্দ হলে আমার সঙ্গে বাজাবি।' সে আমার এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। বাজাতে বসার কিছুক্ষণ আগেই বললেন যে উনি শুদ্ধকল্যাণ বাজাবেন। তখনও পর্যন্ত এই রাগটা জানতাম না। কিন্তু ভাবলাম উনি যখন বলছেন তখন নিশ্চয়ই এটা আমার কাছে আশীর্বাদ। হলভর্তি লোকের সামনে ওনার সঙ্গে বাজাচ্ছি, সে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা, তার পরে উনি কিছুক্ষণ মালকোশ রাগ বাজালেন। পুরোনো কম্পোজিশন বাজিয়ে বা মুখে বলে বোঝাতেন। সেই কম্পোজিশনে তালগুলি কীভাবে যাবে বা রাগটার বেসিক ফেজ বা মোড়গুলি বোঝাতেন। তবে আমি ওনার বাড়িতে থেকে দেখেছি উনি সবসময় কোনো না কোনো সঙ্গীতের ভেতরে থাকতেন ও সংযুক্ত হতেন।

এরপর থেকেই ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ও বিদেশে ওনার সঙ্গে অ্যাকম্পানি করতে লাগলাম। সে যে কী সৌভাগ্য যেটা আমি বলে বোঝাতে পারব না। ওনার সঙ্গে বসেছি, দেখছি পাশে কখনও পণ্ডিত কিষেণ মহারাজ, কখনও জাকিরভাই বসেছেন— এইভাবে ওনাদের সঙ্গে আলাপ ও বাজাবার সুযোগ হতে লাগল।

এখন থেকে ঠিক দুবছর আগে আমেরিকায় সানদিয়োগোয় আমার একটা বাজনা ছিল— ঠিক ছিল গুরুজিও আসবেন একসঙ্গে বাজাতে।

গুরুজির শিক্ষার পদ্ধতি এত সরল ও সুন্দর ছিল যেটাই তিনি শেখাতেন সেটাই যেন মনে গেঁথে বসত। উনি কখনও প্রথাগত ভঙ্গিতে শেখাতেন না। অনেক সময়ে উনি গেয়ে বা নিজে বাজিয়ে শেখাতেন বা বহুসময়ে গাড়িতে বসেই তেহাই-এর তালিম দিতেন বা রাগের চলন বলতেন বা কখনও রাগের বিস্তার গেয়ে শোনাতেন।

আজকের সঙ্গীতবাদন সম্বন্ধে আমি একটা কথাই বলতে পারি যে পরিবর্তন আপনারা দেখছেন সেটাই অবশ্যম্ভাবী। পৃথিবীটা যেমন ঘুরে চলেছে, ঋতুর যেমন পরিবর্তন হচ্ছে দিনের পর রাত যেভাবে আসছে, সংগীতও তেমনি যুগে যুগে পরিবর্তিত হচ্ছে, পরিমার্জিতও হচ্ছে। আগে আমরা বহু পণ্ডিত বা ওস্তাদদের বাজনা শুনতাম, শুনে যে ডেপথ্ ফিল করতাম সেটা হয়তো তরুণ প্রজন্মের কিছু মিউজিসিয়ানের মধ্যে পাই না ঠিকই কিন্তু এটাও ভাবা দরকার যে সামাজিক, অর্থনৈতিক পরিবর্তন হয়েছে, তার ভেতর দাঁড়িয়ে এই সঙ্গীতভাবনা বাঁচিয়ে রাখাটাও একটা বিরাট দায়। আজকালের শিল্পীকে পেটের তাগিদেও অনেক কিছু কম্প্রোমাইজ করতে হয়, তবুতো সঙ্গীতচর্চা থেমে যায়নি। আজকাল বহু শিল্পী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত নিয়ে বহুরকম এক্সপেরিমেন্ট করেছেন। পৃথিবীর বহু ধরনের মিউজিক-এর সাথে আমাদের মিউজিকের যে মিশ্রণ ঘটাচ্ছেন সেটা সবসময়ই গ্রহণীয় বা এটাকে ওয়েলকাম করতে হবে। অনেক গোঁড়া শিল্পী/শ্রোতা সঙ্গীতের অধঃপতন বলে যেটা ভাবছেন, প্রকৃতপক্ষে সেটা নয়। আজকে আমাদের সঙ্গীত সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। সারা পৃথিবীর লোক আমাদের সঙ্গীতচর্চা করছে, রিসার্চ করছেন— সেটা একটা বিরাট ব্যাপার। আর কোনটা সঠিক বা কোনটা বেঠিক, সেটা শ্রোতাই বুঝিয়ে দেবেন বা সময়ের সঙ্গে সঙ্গেই বোঝা যাবে। আমার গুরুজিও বহুভাবে সারা পৃথিবীর সঙ্গীতকে মিক্স করেছেন কিন্তু উনি সবসময় বলতেন যেন আমরা অরিজিনালিটি যেন না ভুলি, নিজেদের আইডেনটিটি যেন না ভুলে যাই। তাই নতুন প্রজন্মের শিল্পীদের বলি, যখন ক্লাসিকাল মিউজিক শিখছো তখন সেটা বজায় রেখে নতুন নতুন এক্সপেরিমেন্ট করো। যাতে আমরা আরো এনরিচড্ হতে পারি। আমার একটা কথা মনে হয় ফিউশন সবসময়ই ভালো কিন্তু ফিউশনটা যেন কনফিউশন না হয়ে যায় অর্থাৎ সঙ্গীতের ধারাগুলি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান বা চর্চা থাকা দরকার, তবেই এই মিক্সিংটা সার্থক হবে।

তরুণ শিল্পীদের প্রতি আমার অনুরোধ যে পারিপার্শ্বিক অবস্থা দেখে হতাশ হবার নেই, গাড়ির চাকা যেমন ঘোরে, আমাদের সঙ্গীতেরও বহু পরিবর্তন/পরিবর্দ্ধন হচ্ছে, তবে আমরা এখনও শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতের ধারক ও বাহক।

আগের দিনের মতন গুরু ও ছাত্রের এখন সময় বড়োই কম। আমি আমার শ্বাশুড়ি বিদুষী মীরা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে শুনেছি তাঁরা সকাল থেকে রাত অবধি গুরুর বাড়িতে থাকতেন— তার ফলে তাঁদের সহবৎশিক্ষা, সঙ্গীতচর্চা, সঙ্গীতভাবনা বা প্রেজেন্টেশন শিখতে পারতেন সেটা হয়তো এখন সম্ভব নয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এখনকার শিক্ষার্থীরা ভীষণ ইন্টেলিজেন্ট, তারা পারিপার্শ্বিক/সামাজিক অবস্থাটা খুব ভালো বোঝে। আগেকার দিনে ছাত্র বা গুরুর উভয়েই সময় ছিল বেশি, সঙ্গীতের প্রতি তাঁদের ভালোবাসা ছিল প্রচুর, কিন্তু এখন উভয় পক্ষের দায়িত্ব বা শ্রদ্ধারও অভাব দেখা যায়।

গুরুজির সঙ্গে থাকায় জর্জ হ্যারিসন বা অন্যান্য বিটলস্-এর সঙ্গীদের সঙ্গে আলাপ হল ও ভাববিনিময় হতে লাগল। যেহেতু আমি পণ্ডিজির সঙ্গেই থাকি, জর্জ হ্যারিসন আমাকে বিশেষ স্নেহ করতেন। একটা কথা না বলে পারছি না যে আমরা তখন ইউরোপ-এ, জর্জ হ্যারিসন হঠাৎ মারা গেলেন, সেই উপলক্ষ্যে লন্ডনে একটা কনডোলেন্স মিটিং-হল। গুরুজি বললেন আমাকে আলাপ বাজাতে। সামনে গুরুজি বসে, পৃথিবীর বিভিন্ন ফিল্ডের শ্রেষ্ঠ লোকেরা এসেছেন ও আমার বাজনা শুনছেন। বাজনার শেষে সকলেই আমাকে ইন্দিভিজুয়ালি এ্যাপ্রিসিয়েট, ধন্যবাদ দিলেন। তার মধ্যে ছিলেন মাইকেল শুমাখার, পল ম্যাকারনি ও বিশিষ্ট শিল্পীরা— একটা জিনিস দেখলাম যে তাঁরা কতটা বিনয়ী, কোনো ইগো নেই।

তাই আমি সকলকেই বলি যে যতটা জানো বা জানেন, সকলের সঙ্গে সমানভাবে শেয়ার করতে যাতে আমার, আপনার সকলেরই লাভ হয়। আমি গুরুজির সঙ্গে বহুবছর থেকেছি, একসঙ্গে খেয়েছি বলে বড়াই করার কিছু নেই, বরঞ্চ ওনার গুণগুলি সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার দরকার যাতে আরো বেশি মিউজিসিয়ান গড়ে উঠতে পারে।